লাভ ক্ষতি

আহমেদ সাবের

-১-

তারা মিয়ার আজ বড় আনন্দের দিন। সাব-রেজিষ্টার অফিসে আজ রায় হওয়ার কথা। নজিব উকিল সাহেব আশা দিয়েছেন,

কোন চিন্তা নাই তারা মিয়া। কাগজ পত্র সব লাইন কইরা রাখছি। যায়গা মত আধার দেওন হইছে। এখন শুধু রায় দেওন বাকী।

তারা মিয়ার চিন্তা যায় না। মনটা ধুকপুক করে। এতগুলান টাকার চক্কর। রায়ে যদি এদিক ওদিক হইয়া যায়।

সবচে চিন্তার বিষয়, তারা মিয়া স্ত্রী শরিফাকে না বলে ওর গয়না নিয়ে এসেছে। নজিব উকিল বার বার করে বলে দিয়েছেন, বেলা বারটার আগে টাকা না পেলে কেইস কোর্টে উঠবেনা। এত ধান্ধাবাজি করে কাগজপত্র জোগাড় করার পর রায়ের সময় কোর্টে কেইস না উঠলে পুরা কষ্টটাই মাঠে মারা যাবে। .... না না, ব্যাপারটা চিন্তা করলেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠে ওর। বেলা দুইটায় ওর কেস উঠবে কোর্টে। তারা মিয়া সকাল নটা বাজতেই শহরে উপস্থিত। সোনার দোকানে গয়নাটা দেখাতেই দোকানদার বলে উঠে,

তারা ভাই, এইটা কই পাইলেন, পুরাটাই খাদ। আপনি বইলা দশ হাজার টাকা দাম কইলাম। অন্য কেউ হইলে, ফিরি দিলেও জিনিষটা ছুইয়া দেখতামনা।

তারা মিয়ার সন্দেহ আর যেতে চায়না। ব্যাটা হারাধন সোনারু বোধহয় ওকে ঠকাচ্ছে। বিয়ের সময় শরিফার বাবার দেওয়া গলার চেইনটা। কম করে হলেও জিনিষটার দাম বিশ হাজার টাকা হওয়া উচিৎ। আর বেটা বলে কিনা দশ হাজার টাকা। কি আর করা। সুযোগ পেলে চামচিকেও হাতিকে লাথি মারে। টাকার দরকার বলে বেটার দাপট সহ্য করতেই হবে। রায়টা হয়ে যাক, তখন দেখা যাবে, কত ধানে কত খই।

শেষে বার হাজারে রফা হয়। টাকা নিয়ে, এগারোটা বাজার আগেই কোর্ট পাড়ায় হাজির তারা মিয়া। সঙ্গে সাঙাত রহমত। শরিফার বাপের গ্রামের ছোকরা। সেই সুবাদে শালা দুলাভাই সম্পর্ক।

রহমতের দৃষ্টি বাজ পাখীকেও হার মানায়। কোর্ট পাড়া লোকে গিজ গিজ। এর মধ্যে চোখের পলকে নাজির উকিলকে বের করে ফেলে সে।

দুলাভাই, ওইযে উকিল সাব। আপনে আক্কাসের চা দোকানে বসেন। আমি উকিল সাবরে ধইরা আনি।

মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় সে। তারা মিয়ার এক হাত পাঞ্জাবীর পকেটে। টাকার বান্ডিলটা টাইট করে ধরা। পকেটমারের দারুন দৌরাত্ব এখানটায়। সাবধানের মার নেই। ঘামে পকেটের হাতটা চটচট করে। আক্কাসের দোকানে টেবিল খালি নেই। সে এক কোনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করে। রহমত আলী মাকুর মত যায়, আর আসে।

দুলাভাই এখনও খাড়াইয়া আছেন! অবাক হয় রহমত। আহেন আমার লগে।

কোনায় একটা টেবিলে দুটা চেয়ার খালি হবার সাথে সাথে রহমত চিলের মত ছো মেরে গিয়ে একটাতে বসে অন্যটাতে হাতের ব্যাগটা রাখে। তারা মিয়া ধীরে ধীরে গিয়ে যোগ দেয়।

উকিল সাব এখনি আইয়া পড়বো। কাগজপত্র সব ঠিক আছে ত? মাল পানি? তারা মিয়ার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় রহমত। তারা মিয়া কিছু বলেনা, শুধু একটু মাথা ঝুকায়।

একটু পর কোর্টের বারান্দায় নজিব উকিলের হৃষ্টপুষ্ট দেহটা চোখে পড়ে। ভাদ্র মাসের দুপুর। গত কয়েক দিন বিরতিহীন বৃষ্টির পর আজ একটু চনচনে রোদ উঠেছে। হাফাতে হাফাতে তারা মিয়াদের টেবিলে এসে, রহমতের ছেড়ে দেয়া চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েন তিনি।

স্যার কি খাইবেন? রহমতের উদগ্র প্রশ্ন।

বিরানীই দিতে কও, সাথে রেজালা। নিস্পৃহ কন্ঠে উত্তর দেন নজিব উকিল।

তিন জনের খাবার আসতে যেমন দেরী হয়না, সাবাড় হতেও নয়।

খাবার শেষ করে আক্কাসের দোকান থেকে বের হতেই রহমত দুটো পান আর এক প্যাকেট ব্যানসন ধরিয়ে দেয় নজিব উকিলের হাতে।

নজিব উকিল মিটমিটে চোখে তারা মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন,

আনছ?

তারা মিয়া বুঝতে পারে না। রহমত ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, টাকা দুলাভাই, টাকা।

তারা মিয়া পকেট থেকে দশ হাজার টাকার বান্ডিলটা বের করে নজিব উকিলের হাতে দিতেই বান্ডিলটা তার কালো কোটের পকেটের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি খবর নিছি। সব ঠিক আছে। ঠিক পৌনে দুইটায় এক নম্বর কোর্টে হাজির থাকবা, দেরী করবা না। বলে নজিব উকিল ওদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান লম্বা পা ফেলে।

ওরা দুজন আম গাছের নীচে পাকা বেঞ্চিতে এসে বসে, গাদা গাদি ভিড়ের মধ্যে।

রহমত, মন্তাজ আলীরে দেখছ?

গুজা মিয়া আইসা আর কি করবো। না আসলেই ভালা। হের কয়ডা পয়সা বাচবো। বলে পান খাওয়া হলুদ দাঁত দেখিয়ে হো হো করে হাসে রহমত।

মন্তাজ আলী তারা মিয়ার চাচাতো ভাই। একটু সামনে ঝুকে হাটে বলে পেছনে ওকে অনেকে গুজা মিয়া বলে ডাকে।

তারা মিয়া আনমনে পান চিবায়। মাথার মধ্যে হাজার চিন্তা জিলাপীর প্যাচের মত জট বাঁধে। গরমে তারা মিয়ার জামা ভিজে একসা। আশে পাশে এক দঙ্গল লোক গিজ গিজ করছে, উচ্চ স্বরে কথা বলছে। মজার ব্যাপার, এত সব হই হল্লার মাঝেও তারা মিয়ার তন্দ্রা পেয়ে যায়।

দুলাভাই। রহমতের ডাকে চমকে উঠে তারা মিয়া।

কি?

আপনেরত চাষবাসের সময় নাই। জমিডা আমারে বাগা দিয়া দিয়েন।

আগেত পাইয়া লই।

পাওনের আর বাকী থাকল কি? সুবল দাসের পোলা নিজে আইসা দলিল কইরা দিয়া গেল।

কিন্তু মন্তাজ আলীর বাপ, মানে আমার চাচারে সুবল দাস জমিটা লেইখা দিয়া গেছে, ইণ্ডিয়া যাওনের আগে।

লিখলে কি, ওইটাত আর রেজিষ্টারী হয়নাই। ওইসব কোর্টে টিকবোনা। নজিব উকিল ওইসব কাগজ ছাতু বানাইয়া ছাড়বো।

-২-

দুপুরে রোদ ছিল। এখন প্রায় পুরো আকাশটাই মেঘে ঢেকে ফেলেছে। মেঘের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পশ্চিম আকাশ জুড়ে। মন্তাজ আলী ফিরে যাচ্ছে কোর্ট থেকে। বড় আশা ছিল, বাপের আমলের সম্পত্তি। এতদিন ধরে চাষ করছে। একটা কলমের খোচায় কি করে তারা মিয়ার হয়ে যায়। কিন্তু তাই হয়ে গেল। কাগজপত্র সাক্ষী সাবুদ বিচার করে বিজ্ঞ তহসিল জজ রায় দিলেন, জমিটার আইনতঃ মালিক তারা মিয়াই বটে।

সুবল দাস ইণ্ডিয়া যাবার আগ পর্য্যন্ত জমিটা বর্গা চাষ করতো মন্তাজ আলীর বাপ।

সুবল দাস যাবার আগে এক রাতে মন্তাজ আলীর বাপকে বললো,

তুমি এতদিন ধইরা জমিটা চাষ করতাছ, ওইটা তুমি রাইখা দেও ইমদাদ ভাই। টাকা পয়সা যা পার দিও। শুধু জানাজানি করবানা।

মন্তাজ আলীর বাপ হালের গরু বেচে জমিটা রাখলো। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। মন্তাজ আলী তখনো পৃথিবীর আলো দেখেনি। আজ এতদিন পরে তারা মিয়াকে কারা কুবুদ্ধি দিয়ে এই ঝামেলাটা বাধালো।

মন্তাজ আলী অভাবী মানুষ। নিজের যেটুকূ জমি আছে তাতে খেটে, অন্যের জমিতে কামলা দিয়ে কোন মতে সংসার চালায়। ওর সঙ্গতি নেই, বড় উকিল ধরার। তাই ফজল মোক্তারই ভরসা।

অবশ্য ফজল মোক্তার আশা দিয়েছিল।

কাগজ না টিকলেও, দখলি সত্বে জমিটা তোমারই থাকার কথা।

ঘরে বেচবার মত তেমন কিছু নাই। আদালতের সমন জারি হওয়াতে জমিটায় ধান ফেলতে পারেনি। সেই বীজের ধান বেচে ফজল মোক্তারের টাকাটা নিয়ে এসেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ওর। তারা মিয়ার যখন জন্ম হয়, ওর বয়স তখন বার বছর। ছোট কালে ওর খুব নেওটা ছিল তারা মিয়া। সেও খুব আদর করতো ওকে। রাতে মাছ ধরতে গেলে তারা মিয়াও পিছু নিত। মাঠে খেলতে গেলে পিছু নিত। মনু ভাইর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতোনা। অনেকেই ভুল করে তারা মিয়াকে মন্তাজ আলীর আপন ভাই বলে মনে করতো।

সেই তারা মিয়া কি থেকে কি হয়ে গেল। মন্তাজ আলীর মতই ক্ষেতের কামলা খেটে দিন চলতো ওর। কি করে হাসেম মেম্বারের দলে ভিড়ে পড়লো। সভায় লোক যোগাড়, নেতাদের খেদমত, রিলিফের গম, কাপড় বিতরন, এসব কাজে জড়িয়ে পড়লো সে। রাতারাতি আঙুল ফুলে প্রায় কলাগাছ অবস্থা। তারপর এলকায় খুনাখুনি হলো, হাসেম মেম্বার পলাতক। আর তারা মিয়া কলাগাছ থেকে প্রায় আঙুলে পরিনত হবার যো আবার। অবস্থা রমরমা থাকতে দু বছর আগে হাসেম মেম্বারের ভাগনি শরিফাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসলো।

বাস ষ্টপে আসতেই বৃষ্টি এসে গেল ঝমঝম করে। তাড়াতাড়ি সে বাসে উঠে পড়লো গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে।

-৩-

দুপুর হয়ে গেছে বেশ আগে। মন্তাজ আলীর স্ত্রী হালিমা নদীর পারে এসে দাড়ায়। বেশীতো পথ নয়। ঘর থেকে বিশ পচিশ গজ হাটলেই নদীর পাড়। পাড়ের উপর থেকে সে নীচের প্রমত্তা নদীকে দেখে। কোলে ছয় মাসের মেয়ে জরিনা। নদীর পানি বাড়ছে। আজ বোধ হয় পুর্নিমা। তাই নদী ফুসে উঠছে।

বাজানরে দেখ, নদীর কেমন গোস্যা হইছে।

চার বছরের ছেলে আইনুল কিছুই বুঝতে পারেনা। অবাক হয়ে বিস্তৃত জলধারার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বেশ মজা পেয়ে যায়। সামনে এগিয়ে যেতে চায়। হালিমা শক্ত করে ওর হাত ধরে রাখে।

নদীটা গত তিনবছরে প্রায় আধ মাইল সরে এসেছে ওদের বাড়ীর দিকে। গত এক বছর ধরে ভাঙ্গনটা এক যায়গাতেই দাড়িয়ে আছে। সবাই আশা করছিল, আর বোধ হয় এদিকে ভাঙ্গবেনা। কিন্তু গত সাপ্তাহ থেকে নদীর এপাড়ে আবার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে।

হালিমা পাগলা পীরের মাজারে শিন্নি মানত করে।

পাগলা বাবা, নদীটারে ঠেকাইয়া দাও। তোমার মাজারে শিন্নি দিমু।

জমিটার দিকে চোখ পড়ে ওর। নদীটা চলে গেছে জমিটার গা ঘেসে। আইনুলের বাপে কইছে, আইজকা নাকি রায় হইবো। এই সময় জমিডায় কিছু না কিছু ফসল থাকনের কথা। কিন্তু আদালত থেইকা সমন আসলো, মামলার নিষ্পত্তি হওনের আগে কেউ জমিডায় চাষ করতে পারবোনা। আইনুলের বাপের কি কান্দন। অভাবের সংসারে তিন মাসের খোরাকীর ব্যাবস্থা নষ্ট হইয়া গেল।

হঠাৎ মনের সুপ্ত ক্রোধটা চাড়া দিয়ে উঠে ওর। সব কিছুর মুলে শরিফা আর তার বাপ। ভাইয়ে ভাইয়ে কত মিল আছিল। তারা ভাই বাড়ীত না আসা পর্য্যন্ত আইনুলের বাপ ছটফট করত। হে আইলে দুইজনে এক লগে খাইতে বসতো। বিয়ার পর তারা ভাই বদলাইয়া গেল। বিয়ার বছর খানেকের মধ্যে উঠানের মাঝখানে ধইঞ্চা গাছের বেড়া উঠলো। ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বাড়ী থাইকা বার হওনের আলাদা পথ।

সন্ধ্যার আর দেরী নাই। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। আইনুলকে টেনে হিচড়ে এক দৌড়ে ঘরে ফিরে আসে হালিমা। আইনুলের ক্ষুধা পেয়েছে বলে ভীষন বিরক্ত করছে। ওকে চারটে মুড়ি দিয়ে রাতের ভাত রাঁধবার জন্য চুলা

ধরাতে বসলো সে। বৃষ্টির জন্য সব স্যাতস্যাতে হয়ে আছে। একটা বাশের নল দিয়ে চুলায় ফুঁ দিতে যেতেই দিকবিদিক প্রকম্পিত করে বজ্রপাতের মত শব্দটা হলো। হালিমার অভিজ্ঞতা থেকে শব্দটার কারন বুঝতে ওর এক মুহুর্তও দেরী হলোনা। নদীর পাড় ভাঙ্গছে, কাছে কোথাও। কোলে জরিনাকে নিয়ে আর অন্য হাতে আইনুল আর মুড়ির পোটলাটা ধরে তীরের মতো বেরিয়ে এলো সে। গন্তব্য, স্কুল ঘর।

-৪-

শরিফার দুঃখ, বাবা ওকে একটা অপদার্থের হাতে তুলে দিয়েছেন। অবশ্য দোষটা বাবার না। সেই পাগল হয়ে গিয়েছিল তারা মিয়ার জন্য। হাশেম মামার সাথে সারাক্ষন আঠার মত লেগে থাকতো লোকটা। মামার ইলেকশানের সময়ই পরিচয়টা হয়। মামার ইলেকশান অফিসে শরিফাও কাজ করতো, লিফলেট বিলি, পোষ্টার-ফেষ্টুন বানানো, এইসব। ধীরে ধীরে পরিচয়টা অনুরাগে রূপান্তরিত হলো। বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে বাবা রাজী হয়ে গেলেন। একটু খবরও নিলেন না, ছেলেটার বংশ কেমন, ছেলেটা কি করে? রুজি রোজকার কি? বাবা যেন ওকে পার করতে পারলে বাঁচেন।

ঠিক শহরে না হলেও, শহরতলীতে বড় হয়েছিল ও। পড়ালেখা করেছিল ক্লাস নাইন অব্দি। সেখান থেকে লোকটা ওকে এই চরের সীমায় এনে উঠাল। পাশে বিশাল নদী। বর্ষায় ফুঁসে উঠে অজগরের মত। ভয়ে শরিফার পরান খাঁচা ছাড়া হবার যো। তারপর তারা মিয়া যাকে ভাবী বলে ডাকে, মহিলাটাকে সে প্রথম থেকেই পছন্দ করেনি। অশিক্ষিত গেঁয়ো মহিলা। কেমন যেন খাই খাই ভাব। তারা মিয়া ভাবী বলতে অজ্ঞান। নানা কৌশল করে ঐ মহিলার খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে এনেছে তারা মিয়াকে। এদিকে ইলেকশানের ধুম ধাড়াক্কা চলে যাবার পর তারা মিয়ারও আয় উন্নতি ভাটার দিকে। ভাগ্য ভাল, বাবা ছিলেন। উনিই পরামর্শ দিয়ে জমিটার একটা রফা করার উপায় করে দিয়েছেন। আজ নাকি জমিটার রায় হবার দিন। লোকটা গেছে সেই সকাল বেলা। ঘরে একা একা দিন কাটতে চায়না শরিফার। কাজের মধ্যে, আট মাসের মেয়ে সিতারাকে দুধ বানিয়ে খাওয়ানো। শহরের কাছাকাছি বড় হয়েছে বলে ওদের মত চলার চেষ্টা করে সে। মেয়ে সিতারাকে প্রথম থেকেই বোতলের দুধ ধরিয়েছে। তারা মিয়া প্রথম প্রথম আপত্তি করতো। কিন্তু শেষমেশ নব বধু শরিফার ইচ্ছার কাছে আত্ম সমর্পন করেছে।

নদীটা ভীষন ফুঁশে উঠেছে আজ। ঘর থেকে গর্জন শুনতে পারছে সে। দুপুরের পর থেকে গর্জনের শব্দটা বেড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভারি কিছু পতনের শব্দ। ওর ভয় করতে থাকে। লোকটা যে সেই সকালে বেরিয়েছে, ফিরবে কখন, কে যানে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামে।

হঠাৎ ভীষন শব্দে কানে তালা ধরে যায় ওর। ভয়ে ভয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে, একটু দুরে একটা গাছ কাত হয়ে নদীর পানিতে ভেঙ্গে পড়লো একটা শব্দ করে। গাছের গোড়ার যায়গাটা পানিতে ডুবে গেল। ভয়ে শরিফার মুর্ছা যাবার উপক্রম। নেশাগ্রস্থের মত ঘরে ফিরে আসে সে। বুঝতে পারেনা কি করবে। বেরিয়ে পড়বে কি? বেরিয়ে কোথায় যাবে? এদিক সেদিক ভেবে শেষ পর্যন্ত তারা মিয়ার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘরের আলো জ্বালায় সে। অন্ধকারে উঠানে বেরিয়ে মন্তাজ আলীর অংশে তাকায়। কিন্তু কোন আলোর চিহ্ন খুঁজে পায়না; কোন শব্দও নয়। ওর ভীষন ভয় করতে থাকে। আবার একটা শব্দ হয়। মনে হয় অনেক কাছে। পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠে। আর অপেক্ষা নয়। দ্রুত ঘরে ঢুকে সিতারাকে বুকে নিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে এল সে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? কিছু দুর যাবার পর কয়েকজন মানুষের দেখা পেয়ে নিঃশব্দে ওদের পিছু নিল সে। সবার গন্তব্য একই, প্রাইমারী স্কুল।

-৫-

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হাটতে হাটতে আইনুল ক্লান্ত। অনেকক্ষন ধরেই ঘ্যান ঘ্যান করছিল। হাটতে পারছিলনা সে।

আর একটু বা'জান। আমরা চইলা আইছি। ঐ যে স্কুল ঘর দেহা যায়।

দুরে স্কুল ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। জরিনাকে এক হাতে বুকের সাথে লেপ্টে ধরে শাড়ীর একটুখানি আঁচল দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দেয় হালিমা। অন্য হাতে আইনুলকে মাঝে মাঝে টেনে হিচড়ে, মাঝে মঝে কোলে নিয়ে যখন ও স্কুল ঘরে পৌছে, ওর বুক হাফরের মত উঠা নামা করছে।

স্কুল ঘর মানুষে গিজ গিজ করছে। এক কোনে একটু যায়গা পেয়ে বসে পড়ে সে। আইনুল ক্ষুধায় কাঁদছে। জরিনাও কান্না শুরু করে দিয়েছে। ওরও বোধহয় ক্ষুধা পেয়েছে। ভাগ্য ভাল, কোমরের সাথে প্যাচানো মুড়ির ছোট পোটলা টা পথে পড়ে যায়নি। পোটলাটা আইনুলের হাতে দিয়ে জরিনাকে বুকের দুধ খাওয়াতে মাটিতে বসে পড়ে হালিমা।

বারান্দায় হ্যাজাক জ্বেলে ইটের চুলায় খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। কি নিয়ে তুমুল শোরগোল হচ্ছে। হালিমার এতক্ষনে আইনুলের বাপের কথা মনে পড়ে।

-৬-

এক দল লোকের সাথে স্কুল ঘরে পৌছে শরিফা বুঝতে পারেনা কি করবে। সে কখনো বন্যা দেখেনি, নদী ভাঙ্গা দেখেনি। খাবারের জন্য কারু কছে হাত পাতেনি। ওর ধোপ দুরস্ত কাপড়ের জন্য হোক, কিংবা করুন অবস্থার জন্যে হোক, সে এক ছোকরা নেতার নজরে পড়ে যায়।

আসেন, আসেন। আপনি এদিকে আসেন।

ওইটা তারা ভাইর বৌ, ফিস ফিস করে বলে আরেক ছোকরা নেতা এগিয়ে আসে।

আসেন ভাবী, আসেন।

একটা চাটাই পাতা যায়গার শরিফার যায়গা হয়ে যায়।

শরিফার আর তেমন খারাপ লাগেনা। শত হোক, ছোকরা গুলো ওর বেশ খাতির করেছে। এই প্রথম তারা মিয়াকে ওর আর অপদার্থ বলে মনে হয়না। ছোকরা গুলো কেমন তারা ভাই. তারা ভাই করছে। কিন্তু লোকটা যে গেল, আর ফেরার নাম নাই।

হঠাৎ করেই সিতারা কান্না জুড়ে দেয়। এবং সাথে সাথে দুশ্চিন্তায় শরিফার মুখ পাংশে হয়ে উঠে। সর্বনাশ, সিতারার দুধ আনা হয়নি, বোতল আনা হয়নি।

অন্ধকারে গিয়ে মেয়ের মুখে স্তন গুজে দেয় শরিফা। সিতারা আপ্রান চুষে দুধ না পেয়ে আরও জোরে চিৎকার জুড়ে দেয়।

কি হইছে শরিফা? হালিমার কন্ঠস্বরে চমকে উঠে শরিফা।

সিতারার ক্ষুধা পাইছে। ওর দুধের বতল আনা হয়নাই। এখন ওরে লইয়া কি যে করি ভাবী। এই প্রথম হালিমাকে সে ভাবী বলে সম্বোধন করল।

দাও, আমার কাছে দাও সিতারারে।

শরিফার কোল থেকে সিতারাকে নিয়ে অন্ধকার কোনে বসে পড়ে হালিমা। ওর এক কোলে জরিনা আর অন্য কোলে সিতারা। সিতারা আইনুলকে কোলে নিয়ে পাশে বসে পড়ে।

-৭-

বাসে থেকে নেমেই নদী ভাঙ্গনের খবর পায় মন্তাজ আলী। মাইলখানেক হাটা পথ, দ্রুত পা চালায় সে। অনেক লোক স্কুল ঘরের দিকে যাচ্ছে। ওদের পাশ কাটিয়ে উল্টা দিকে পা চালায় সে। মাথার মধ্যে দুনিয়ার চিন্তা। ওদের বাড়ীটা কি এখনো টিকে আছে? বৌ, ছেলে-মেয়ের খবর কি?

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই সে বুঝতে পারে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। জমি, তারা মিয়ার বাড়ীর পুরা অংশ, ওর থাকার ঘর পানির নীচে চলে গেছে। একমাত্র ওর রান্না ঘরটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাও যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর স্ত্রী সন্তান থাকার ঘরের সাথে পানিতেই ডুবে গেছে। প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

আস্তে আস্তে বিপরীত চিন্তা স্থান নেয় ওর মনে। না, হালিমা বুদ্ধিমতী মহিলা। আর নদী ভাঙ্গন নতুন নয় ওর কাছে। হয়তো সময় মত সরে পড়তে পেরেছে সে। আশায় বুক বেঁধে স্কুল ঘরের দিকে ছুটতে থাকে সে পাগলের মত।

স্কুল ঘরে পৌঁছে হালিমাকে খুঁজে পায়না সে। মনের মাঝে নিরাশার কালো মেঘটা বড় হতে থাকে আবার। হঠাৎ এক কোনে অন্ধকারে নজর পড়ে ওর। ধীরে ধীরে কাছে আসে সে। দেখে দুই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হালিমা। আইনুল কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। আর ওর গায়ে হাত রেখে পাশে শুয়ে শরিফা।

হয়তো মন্তাজ আলীর পায়ের আওয়াজ শুনে থাকবে হালিমা। চোখ তুলে। চোখে চোখ পড়ে মন্তাজ আলীর চোখে। প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠে ওর চোখে মুখে। একটা প্রবল ভার মুক্তির হাসি ফোটে মন্তাজ আলীর চোখেও। নিঃশব্দে সরে যায় সে।

নদী ভাঙ্গা ঘরের টানে নিজের অজান্তে আবার বাড়ীর দিকে পা ফেলে মন্তাজ আলী। আকাশে কালো মেঘ। ধীরে ধীরে ভাঙ্গা রান্না ঘরের পাশে আম গাছের নীচে এসে দাড়ায় সে। পাশে প্রবল গর্জনে বয়ে যাচ্ছে অন্তহীন কালো স্রোত। যেখানে জমি ছিল, ঘর ছিল, সব গ্রাশ করেছে সর্বনাশা নদী। চোখে অশ্রু বন্যা নামে ওর বৃষ্টি ধারার মতো।

-৮-

কোর্ট শেষ হবার পর, তারা মিয়া, রহমত আর সাব-রেজিষ্টার অফিসের পিয়ন আমানউল্লা মায়া হোটেলে বিজয় উদযাপন করতে এসেছে। বিরানী পর্ব শেষ করে এখন চা, সিগারেট পর্ব চলছে। রাত প্রায় আটটা।

দুলাভাই, শেষ বাস ছাইড়া দিবো। রহমত মনে করিয়ে দেয় তারা মিয়াকে।

আরে সর্বনাশ, বলে লাফ দিয়ে উঠে তারা মিয়া। এর পর রিকসা লইতে হইবো। তাড়াতাড়ি বাসে উঠে তারা মিয়া। রহমত আর আমানউল্লা যার যার পথে চলে যায়।

বাসে উঠেই নদী ভাঙ্গার খবর পায় সে। তবে তেমন পাত্তা দেয়না। নদী এখনো ওদের বাড়ী থেকে প্রায় পচিশ গজ দুরে। আর ভাঙ্গনের তেমন আলামতও দেখা যায়নি। আর ভাঙ্গলেও, অন্য দিকে ভাঙ্গার কথা। বেশ খোশ মেজাজেই ওদের বাড়ীর কাছের ষ্টপে নামে তারা মিয়া।

স্কুল ঘরের হই হল্লা কানে আসে ওর। সেদিকে নজর না দিয়ে দ্রুত বাড়ীর দিকে পা ফেলে সে।

শরিফার লাইগা কিছু আননের কাম আছিল। নিজের ভুলটা ধরা পড়ে ওর। এমন একটা খুশীর খবর খালি হাতে দেওন লাগবো।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই নদীর গর্জন কানে আসে ওর। শব্দটা কেমন বেখাপ্পা লাগে। তবু হতাশ হয়না সে। আর একটু কাছে আসতেই, কালো রাত্রির ঝাপসা আলোয় পুরো নদীটা ওর চোখের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে।

ও আল্লারে! বলে একটা চিৎকার দিয়ে ভেজা মাটিতে বসে পড়ে সে। নদী আমার শরিফা আর সিতারারে গিল্লা খাইছেরে। পাগলের মত মাথার চুল ছিড়তে থাকে তারা মিয়া।

একটু দুরে আত্ম নিমগ্ন মন্তাজ আলীর কানে কোন শব্দই পৌঁছায়না। হয়তোবা নদীর শব্দের জন্য।

হঠাৎ করে, আমগাছের নিবিড় অন্ধকারে, একটা ছায়া মুর্ত্তির উপর নজর পড়ে তারা মিয়ার। চিনতে অসুবিধা হয়না। আস্তে আস্তে কিছুটা সঙ্কোচ, কিছুটা দ্বিধা নিয়ে মন্তাজ আলীর কাছে এসে দাঁড়ায় সে। মন্তাজ আলী কিছুই টের পায়না। তারা মিয়ার মুখে কোন কথা নেই। কতগুলো নিস্তব্ধ মুহুর্ত কেটে যায়। পাশে প্রচন্ড গর্জনে নদী বয়ে যায়।

মনু ভাই, আমার সর্বনাশ হইছে। শরিফা আর সিতারারে নদী গিলা খাইছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠে তারা মিয়া।

নদীর বিরতিহীন গর্জনের সাথে তারা মিয়ার শোকাহত কন্ঠ একাকার হয়ে যায়। চমকে উঠে মন্তাজ আলী। তার পর ধীর পায়ে এগিয়ে আসে তারা মিয়ার দিকে। তারা মিয়া পাগলের মত মন্তাজ আলীকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলে।

Sydney 8 July - 2 Aug , 2006